The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIV, 2018 (pp. 81 - 94)
Published in October, 2023

বৌদ্ধ দর্শনে অনাত্মবাদঃ স্বরূপ বিশ্লেষণ

ড. সুদীপ্তা বড়ুয়া*

প্রতিপাদ্যসার

মানব সভ্যতার প্রারম্ভকাল থেকে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে যে, মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি? উত্তর পেয়েছে যে, মৃত্যুর পর সব শেষ হয়ে যায় না, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে। তখন জানতে চাওয়া হলো, কী বা কে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে? উত্তর হলো 'আত্মা'। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে আত্মার স্বরূপ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কারো মতে, জগৎ ও আত্মা শ্বাশত; কারো মতে, আত্মা আংশিক স্থায়ী ও আংশিক অস্থায়ী। কারো মতে, আত্মার অন্ত আছে , কারো মতে আত্মা অনন্ত। কারো মতে, আত্মা ও জগৎ অকারণ সম্ভূত ; কারো মতে মৃত্যুর পর জীব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কারো মতে, আত্মা বলতে কিছুই নেই, মৃত্যুর পর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। যখন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র এসব বিভিন্ন মতবাদে পরিপূর্ণ হয়েছিল, ভারতের সেই যুগসন্ধিক্ষণে তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ভারতীয় দার্শনিক ভাব ধারায় সম্পূর্ণ নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি ভারতীয় ধর্মদর্শনের চিরাচরিত বহু মতবাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে নতুন মত প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে আত্মবাদ অন্যতম। গৌতম বুদ্ধ আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদকে পুরোপুরি অস্বীকার করে বললেন, জগতে আত্মা নামক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এই আত্মবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধের যে মতবাদ এটিকে বলা হয় 'অনাত্মবাদ'। আলোচ্য প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে করা হয়েছে। তথ্য উপাত্তগুলোতে প্রাথমিক উৎস এবং দ্বৈতীয়িক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তগুলো পালিভাষায় লেখা, তবে সব গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ রয়েছে। এছাড়া দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন আত্মাকে স্বীকার করে না। ভারতীয় সবকটি দর্শন আত্মাকে স্বীকার করে এবং জীবের মৃত্যুর পর অশরীরী আত্মা কর্মানুযায়ী পূর্নজন্ম গ্রহণ করে। বৌদ্ধদর্শন এ মত সমর্থন করে না। তথাগত বুদ্ধ কেন বহুকালের

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচলিত বিশ্বাসকে পুরোপুরি অস্বীকার করে 'অনাত্মবাদ' প্রতিষ্ঠা করেছেন তার ওপর তথ্যনির্ভর আলোচনা করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ অনাত্মবাদের সপক্ষে যাঁরা যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ভদন্ত নাগসেন ও গ্রীকরাজ মিলিন্দের কথোপকথন, আচার্য নাগার্জুন, আচার্য অসঙ্গ, আচার্য বসুন্ধু, আচার্য ধর্মকীর্তি, Ven.Walola Rahula , প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনে 'আত্মবাদ' ও 'অনাত্মবাদ' দার্শনিক সিদ্ধান্তে ভিন্নতর মতবাদ লক্ষ করা যায়। শ্বাশত আত্মায় বিশ্বাসী দর্শনই হচ্ছে আত্মবাদী দর্শন। আর শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাসহীন দর্শনকে অনাত্মদর্শন বলে। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধদর্শনই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না; তাই এটিকে অনাত্মবাদী দর্শন বলা হয়। বলা যায়, আত্মাবাদের বিপরীত মতবাদই হলো অনাত্মবাদ। ভারতীয় সবকয়টি দর্শনই আত্মবাদে বিশ্বাসী; যদিও বিভিন্ন দর্শন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্ম আত্মার অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন। বস্তুত ধর্মসমূহে আত্মা এক কল্পনা বিশেষ। তাই ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, ''ভিক্ষুগণ! এই ধর্ম (বস্তু) ই আত্মা। ভিক্ষু! আমার সেই আত্মা অধ্রুব, অন-আশ্বাসিক, বিপরিনামী (বিকার) এখানে সংস্কার (কৃত বস্তু ঘটনা) সমূহেই সত্ত্বের কল্পনা বুঝতে হবে। জগতে ব্যবহারের সুবিধার্থে এরূপ করা হয়। বস্তুত সত্ত্ব বা আত্মা নামের কোনো বস্তু কিছু নেই (সাংকৃত্যায়ন ২০১২, ৮৮)।

ভারতীয় দর্শনে আত্মা

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন হতে মানুষ চিন্তা করতে শুরু করেছে যে মৃত্যুর পরে মানুষের কোনো অস্তিত্ব থাকে কিনা। ভারতীয় সবকয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় স্বীকার করেছেন যে, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে এবং পুনর্জন্ম গ্রহণ করে 'আত্মা'। মানুষের দেহ পঞ্চস্কন্ধের তথা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমষ্টিমাত্র, যাকে নাম-রূপ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই নাম-রূপ বা পঞ্চস্কন্ধের একমাত্র পরিচালক হচ্ছে আত্মা। গীতায় আত্মাকে অবিনশ্বর, অক্ষয়, অব্যয় ও নিত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। মানব জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করার ন্যায় মৃত্যুর পর দেহকে ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। এই দেহীকে বলা হয়েছে আত্মা - যা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, নিত্য, সর্বগামী, স্থিরস্বভাব, অচল এবং সনাতন।[১]

বৌদ্ধ দর্শন ব্যতীত ভারতীয় অপরাপর দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত। এ মতের ভিত্তি হলো উপনিষদ বা বেদান্ত। চার্বাক ও বৌদ্ধ দর্শন বেদ বিরোধী বিধায় এ দুইটিকে নাস্তিক দর্শন বলা হয়। কিন্তু চার্বাক দর্শন দেহাতিরিক্ত সত্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। চার্বাক মতে আত্মা চৈতন্যময় ও অসংখ্য। মানবদেহ ছাড়াও প্রতিটি জীবদেহে, গাছপালায় এমন কি ধূলিকণাতেও আত্মা বিদ্যমান বলে চার্বাকবাদীদের অভিমত। তাঁদের মতে, দেহ উৎপত্তি, বিনাশশীল ও জড়। আত্মাও উৎপত্তি-বিনাশশীল ও জড়। কারণ দেহই আত্মা (সেন ১৯৮৫, ১০৪)। তবে চার্বাকরা দেহাতিরিক্ত কোনো সত্তা আছে বলে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে দেহ ও আত্মা অভিন্ন; দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ হয়। জৈন দর্শনও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। জৈনদের মতে আত্মা অসংখ্য। তাঁরা বলেন, যদি একাধিক আত্মা না থাকতো, যদি একই আত্মা সর্বভূতে বিরাজ করতো তাহলে এক জীব হতে অন্য জীব আলাদা করার উপায় থাকতো না। জীবের কর্মফলও বিভিন্ন হতো না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কিংবা পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এসবের ভেদাভেদও থাকতো না। পাপ-পুণ্যের ফলাফলেও ভেদাভেদ থাকতো না (সান্যাল ২০০২, ৯৪)। সাংখ্য ও যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনও দেহ ও মন থেকে পৃথক অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে সাংখ্য ও যোগ

দার্শনিকরা যেখানে আত্মাকে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ মনে করেন, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে চৈতন্য আত্মার অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়। দেহের সংস্পর্শে এলেই শুধুমাত্র আত্মা চৈতন্যময় হয় (চাকমা ১৯৯০, ৬৭)। সাংখ্য দর্শন মতে, পুরুষ বা আত্মা দেহ নয়, মন নয়, বুদ্ধি নয়, ইন্দ্রিয়ও নয়। আত্মা এসব থেকে পৃথক। দেহের মধ্যে যিনি বাস করেন তিনিই আত্মা বা পুরুষ। পুরুষ হচ্ছে এক স্বতন্ত্র সত্তা, যা সবসময়ই জ্ঞাত কিন্তু কখনো জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় নয়। আত্মা হলো 'চৈতন্যস্বরূপ'। বিশুদ্ধ চেতনাই আত্মা (সান্যাল ২০০২, ২৬৭-২৬৮)। যোগ দর্শনেও আত্মার ধারণা সাংখ্য দর্শনের অনুরূপ। যোগদর্শন মতে আত্মা দেহ, মন ও বুদ্ধির এক অতিরিক্ত, এক বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আধ্যাত্মিক সত্তা। সাংখ্য দর্শনের সাথে যোগদর্শনের আত্মবাদে মিল লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকদের আত্মা সম্পর্কে ধারণায় সামঞ্জস্য রয়েছে। নৈয়ায়িকদের মতে, আত্মা হলো অচেতন দ্রব্য, এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা অবস্থান করে। তাঁদের মতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয় কিংবা অপরিহার্য বা অবিচ্ছেদ্য গুণও নয়। আত্মা সাধারণত অচেতন ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন আত্মায় চেতনা বা বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। বুদ্ধি, সুখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলো হলো কতকগুলো গুণ। এই গুণগুলো কোনো দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকবে এবং এই দ্রব্যই হলো আত্মা (সেনগুপ্ত ১৯৯৯, ২৪৮)। নৈয়ায়িকরা হলেন বস্তুবাদী। তাঁরা বলেন, আত্মা অতিভৌতিক দ্রব্য। এক একটি বিশেষ আত্মা এক একটি দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। আত্মা হলো শাশ্বত এবং সর্বত্রব্যাপী। আত্মাকে দেহ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। বৈশেষিকরা বলেন, আত্মা হলো এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য এবং জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা দু'প্রকার ; জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। পরমাত্মা হচ্ছেন ঈশ্বর। পরমাত্মা জীবাত্মা থেকে স্বতন্ত্র এবং এই আত্মা বিশ্বস্বরূপ ও শুদ্ধাত্মা। পরমাত্মাই জগতের সৃষ্টি-ধ্বংসকর্তা। তিনি রূপহীন, প্রত্যক্ষের বিষয় নন। তাঁর অস্তিত্ব অনুমান ও শব্দ প্রমাণগম্য। প্রত্যেক জীবে রয়েছে একটি করে আত্মার অধিষ্ঠান।

সুতরাং আত্মা বিভু হলেও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা নিত্য, শাশ্বত, বিনাশহীন। জীবের দেহের যখন বিনাশ হয় তখন আত্মা অন্য দেহ ধারণ করে (সেনগুপ্ত ১৯৯৯, ২১০-২১১)। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মতে আত্মা বহু। জীবের মধ্যে বৈষম্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই উভয় দর্শন মতে আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, দেহের সংস্পর্শে এসে আত্মা চেতনা লাভ করে।

ভারতীয় দর্শনে আত্মার স্বরূপ সংক্ষেপে মূল্যায়ন করেছেন প্রফেসর নীরু কুমার চাকমা। তিনি বলেন,

> সাংখ্য ও যোগ, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকরাও দেহ ও মন থেকে স্বতন্ত্র অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে সাংখ্য ও যোগ দার্শনিকরা যেখানে আত্মাকে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলে মনে করেন, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের মতে চৈতন্য আত্মার অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়। দেহের সংস্পর্শে এলেই শুধু মাত্র আত্মা চৈতন্যময় হয়। মীমাংসা আত্মাকে একটি সর্বব্যাপী, নিত্য ও অবিনশ্বর সত্ত্বা হিসেবে অভিহিত করেছেন। বেদান্ত দর্শনে আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, অমর, অনন্ত ও অনাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তে আত্মা বলতে ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে ; অপরদিকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয় বলে বলা হয়েছে। অন্যকথায়, অদ্বৈত বৈদান্তিকদের মতে ব্রহ্ম ও আত্মার সম্পর্ক হল অভেদের ; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে আত্মা ও ব্রহ্মর সম্পর্ক হল ভেদ ও অভেদের (১৯৯০, ৬৭)।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় উক্ত দার্শনিকসম্প্রদায় সমূহের মধ্যে আত্মা সম্পর্কে মত পার্থক্য তেমন খুব একটা নেই। তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে, আত্মা হলো দেহাতিরিক্ত চৈতন্যময় এক শাশ্বত সত্তা। আত্মা সম্পর্কিত উক্ত মতবাদের ব্যতিক্রম হলো চার্বাক ও বৌদ্ধ দর্শন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চার্বাক দর্শন

দেহাতিরিক্ত কোনো সত্তায় বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, দেহ ও আত্মা অভিন্ন, দেহ বিনাশ হলে আত্মারও বিনাশ ঘটে। অপরদিকে বৌদ্ধ দর্শন আত্মা স্বীকারই করেন না।

বৌদ্ধ দর্শনে আত্মার স্বরূপ

বুদ্ধ ছিলেন নৈরাত্ম্যবাদী, বুদ্ধ কোনো শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কেননা বুদ্ধের মতে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। বুদ্ধের যুক্তি হলো যেসব উপাদানের সমন্বয়ে মানবদেহ গঠিত তার প্রত্যেকটি অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করলে কোনো শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব খোঁজে পাওয়া যায় না। মানবের রূপ বা দেহ নিত্য নহে ; যা নিত্য নহে তা অবিনশ্বর বা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপ্রদ। যা অনিত্য ও দুঃখপ্রদ এবং পরিবর্তনশীল তাকে শাশ্বত 'আত্মা' বলা যায় না। ক্ষুদ্রবেদল্ল সূত্রে বুদ্ধ আত্মবাদ সম্পর্কে বলেন,

> আত্মা রূপবান, আত্মায় রূপ, রূপে আত্মা, আত্মা বেদনাবান, আত্মায় বেদনা, বেদনায় আত্মা, আত্মা সংজ্ঞাবান, আত্মায় সংজ্ঞা, সংজ্ঞায় আত্মা, আত্মা সংস্কারবান, আত্মায় সংস্কার, সংস্কারে আত্মা, আত্মা বিজ্ঞানবান, আত্মায় বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে আত্মা। এভাবে পঞ্চস্কন্ধের প্রত্যেকটিতে অথবা সবকয়টিতে যে চিন্তা ও বিশ্বাস তাকে সৎকায় দৃষ্টি বা আত্মবাদ বলে (সাধন কমল চৌধুরী ১৪১৫, ১৮৩) ।

বুদ্ধ অলগর্দ্দোপম সূত্রে বলেছেন,

> এই রূপ আমার, আমিই রূপ, এটাই আমার আত্মা। এই বেদনা আমার, আমি বেদনা, এটাই আমার আত্মা। এই সংজ্ঞা আমার, আমি সংজ্ঞা, এটাই আমার আত্মা। এই সংস্কার আমার, আমি সংস্কার, এটাই আমার আত্মা। যা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, মত (অনুমতি), বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অন্বেষিত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তাও আমার, আমি তাই, তা-ই আমার আত্মা। এই যে দৃষ্টিস্থান-সে-ই লোক বা জগৎ, সে-ই নিজস্ব আত্মা (নিজস্ব বস্তু), সে-ই আমি পরে হব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী, আমি চিরকাল একইরূপ থাকব, তা-ও আমার, আমি তা, তা-ই আমার আত্মা। এরূপ বিশ্বাসই আত্মবাদ (বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯৪০, ১৪৯-১৫০)।

পক্ষান্তরে অনাত্মবাদ বা অনাত্মদৃষ্টি সম্পর্কে বুদ্ধ বলেন,

> এই রূপ আমার নয়, আমি রূপ নই, রূপ আমার আত্মা নয়। এই বেদনা আমার নয়, আমি বেদনা নই, বেদনা আমার আত্মা নয়। এই সংজ্ঞা আমার নয়, আমি সংজ্ঞা নই, সংজ্ঞা আমার আত্মা নয়। এই সংস্কার আমার নয়, আমি সংস্কার নই, সংস্কার আমার আত্মা নয়। যা কিছু দৃষ্টি, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তা-ও আমার নয়, আমি তা নই, তা আমার আত্মা নয়। এই যে দৃষ্টিস্থান সেই লোক, সেই আত্মা, সেই আমি পরে হব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত অবিপরিণামী আমি চিরকাল একই রূপে থাকব, তা-ও আমার নয়, আমি তা নই, তা আমার আত্মা নয়। – এরূপ বিশ্বাসই অনাত্মবাদ বা অনাত্মদৃষ্টি (বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯৪০, ১৪৯-১৫০)।

কোনো কোনো গবেষক 'আত্মা' সম্পর্কে বৌদ্ধ মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে বুদ্ধ পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন যে, আত্মা নিত্য, নির্বিকার ও সুখস্বরূপ (রহমান ২০১৩, ২১৬-২৩৬)। কিন্তু পিটক গ্রন্থের কোথায়ও আত্মার নিত্যতা স্বীকার করতে দেখা যায় না। তিনি 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' দেশনা করার এক সপ্তাহের মধ্যেই 'অনাত্ম লক্ষণ সূত্র' দেশনা করেছিলেন। কারণ অনাত্ম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন না হলে 'আমিত্ব' 'মমত্ব' বা 'নিত্যতা' ইত্যাদি ধারণা দূরীভূত হয় না এবং এসব ভ্রান্ত ধারণা দূর না হলে চিত্ত আসবমুক্ত হতে পারে না। চিত্ত আসবমুক্ত না হলে দুঃখমুক্তি বা নির্বাণ লাভও সম্ভব নয় (সুকোমল চৌধুরী ১৯৯৭, ৭০)। এ প্রসঙ্গে ড. মলসেখর বলেন,

> বুদ্ধ ধর্মচক্র সূত্রে চতুরার্যসত্য এবং অন্তিম সত্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেশনা করার পরও অনাত্মলক্ষণ সূত্র দেশনার মাধ্যমে অনাত্মদর্শন সম্বন্ধে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের সম্যক অবহিত করেছিলেন যে, চিরস্থায়ী আত্মা

বলতে কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ 'অনাত্ম' বিষয়ে জ্ঞান লাভ ব্যতীত চতুরার্য সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় (১৯৮৭ , ২৭) ।

বুদ্ধ 'অনাত্মলক্ষণ সূত্রে' (*সংযুক্ত নিকাযো* ২০১৩, ৪৭) স্পষ্ট করে বলেছেন, পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়েই জীবদেহ গঠিত। পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপ আত্মা নহে। রূপ যদি আত্মা হতো তাহলে এটা দুঃখের অধীন হতো না। দেহী বলতে পারতেন , 'আমার দেহ এরূপ হোক, আমার দেহ এরূপ না হোক'। কিন্তু এরূপ তো হয় না। দেহ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন দুঃখ নিপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছে। অতএব দেহ বা রূপ আত্মা হতে পারে না। অনুরূপভাবে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানও নিয়ত পরিবর্তনশীল। যা পরিবর্তনশীল তা নিত্য নয় এবং যা অনিত্য তার নিত্য বা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

বুদ্ধের মতে, জীব মাত্রই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি ব্যতীত কিছু নয়। এই পঞ্চস্কন্ধকে অন্যভাবে 'নামরূপ' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। রূপ বলতে মাটি, জল, তেজ ও বায়ুর সমন্বয়ে গড়া জড়দেহকে বোঝায়। নাম বলতে বোঝায় বেদনা অর্থাৎ অনুভব (feeling), সংজ্ঞা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ (perception), সংস্কার অর্থাৎ মানসিক প্রবণতা (mental dis-position) এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ সংবেদনা (self consciousness)। নিম্নে নাম-রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

নাম চার প্রকারঃ

১. বেদনা: দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, রসেন্দ্রিয়,স্পর্শেন্দ্রিয় ও মনেন্দ্রিয় - এই ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয়ের রসানুভূতিই বেদনা। সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা, সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য ভেদে বেদনা পাঁচ প্রকার।

২. সংজ্ঞা: সংজ্ঞা বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয় দ্বারে পতিত হওয়ার সাথে সাথে বিষয় সম্বন্ধে প্রথম প্রতীতিকে বোঝায়। এতে গোচরীভূত বিষয়ের সাথে পরিচয় হয় মাত্র এবং বিষয়ান্তরের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। সংজ্ঞার বিশেষ লক্ষণ হলো কোনো বিষয়কে তার চিহ্ন দ্বারা জানা, যেমন লাল-নীল ইত্যাদি।

৩. সংস্কার: মনোবৃত্তিসমূহই সংস্কার স্কন্ধ। সংস্কার প্রত্যয়জাত, সমবায়ে উৎপন্ন। বিশ্বের জড়-চেতন সমস্ত উপকরণ যাতে কার্যকারণ প্রবাহ অটুট থাকে তা-ই সংস্কার।

৪. বিজ্ঞান: দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম বা মনোবিজ্ঞান ভেদে ষড়বিধ বিজ্ঞান স্কন্ধ। মনোবিজ্ঞানের সাথে অন্য সব বিজ্ঞানের একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান।

রূপ চার প্রকার :

১. ক্ষিতি: ক্ষিতি বলতে পৃথিবী ধাতুকে বোঝায়। দৈহিক বা বাহ্য সকল কঠিন বস্তুই ক্ষিতি বা পৃথিবী ধাতু। এটির দু'টি প্রধান লক্ষণ কোমলতা ও কঠিনতা।

২. অপ্: দৈহিক বা বাহ্য সকল বস্তুই অপ্ ধাতু। এটি এমন একটি ধাতু যা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কণাকে সংযোজন করে 'দেহ' ধারণা এনে দেয়। তরলতা এবং সংকোচন এই ধাতুর প্রধান ধর্ম।

৩. তেজ: দৈহিক বা বাহ্যিক সকল উষ্ণতা বিধায়ক বস্তুই তেজ ধাতু। সজীবতা এবং পরিপক্কতা এ ধাতুর উপস্থিতিতেই হয়ে থাকে। শীতলতা এবং উষ্ণতা উভয়ই তেজ ধাতুর ধর্ম।

৪. বায়ু: দৈহিক বা বাহ্য সকল গতিশীল বস্তুই বায়ু ধাতু। এর প্রধান গুণ গতিশীলতা। গমন, স্পন্দন, দোলন এবং চাপ দান এ ধাতুর লক্ষণ।

উপর্যুক্ত নাম-রূপ বা পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়ে জীবদেহ গঠিত। এই নামরূপ বা পঞ্চস্কন্ধ সম্মিলিতভাবে কিংবা পৃথকভাবে কোনোটিই শাশ্বত আত্মা নয়। এ প্রসঙ্গে তথাগত বুদ্ধ বলেন,

> যেহেতু রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান - এই পঞ্চস্কন্ধ কোনোটিই নিত্য বা শাশ্বত নয় এবং যা নিত্য নয় তা দুঃখময়। অতএব, হে ভিক্ষুগণ! যা কিছু রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার অথবা বিজ্ঞান অতীত, অনাগত অথবা বর্তমান, আধ্যাত্মে অথবা বাইরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরে অথবা নিকটে, সব রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আমার নহে, আমি তা নই, তা আমার আত্মা নহে (বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯৪০, ১৪৭)।

উপর্যুক্ত পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি বা যে- কোনো একটি স্কন্ধকে 'আত্মা' হিসেবে মেনে নেওয়া নিছক ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়। কারণ যে সকল উপাদানের দ্বারা মানব দেহ গঠিত তার প্রত্যেকটি (পঞ্চস্কন্ধ) অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার কোনোটির মধ্যে আত্মা নামক বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং কোনোটির সঙ্গে আত্মার তুলনা চলে না। কারণ এগুলোর মধ্যে আত্মার লক্ষণ নেই। যা অনিত্য, দুঃখপ্রদ এবং পরিবর্তনশীল তাকে এটা আমার, এটা আমি, এটা আমার আত্মা বলা যাবে না (মহাথের ২০০০, ২১)। মোটকথা পঞ্চস্কন্ধের প্রতিটি স্কন্ধ নিত্য পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এখানে শাশ্বত 'আত্মার' কল্পনার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ পণ্ডিত জ্ঞানতিলক থের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন:

> The anatta doctrine teaches that neither within the bodily and mental phenomena of existence, nor outside of them, can be found anything that in the ultimate sense could be regarded as a self-existing real Ego-entity, soul or any other abiding substance. This is the central doctrine of Buddhism without understanding of which a real knowledge of Buddhism is altogether impossible. It is the only realy specific Buddhist doctrine, with which the entire structure of the Buddhist teachings stands or falls. All the remaining Buddhist doctrines may, more or less, be found in other philosophic systems and religions, but the Anatta Doctrine has been clearly and unreservedly taught only by the Buddha, (1980, 33-34).

– অনাত্ম দর্শন হচ্ছে - শরীরে বা চিত্তে বা এদের বাইরে এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই যাকে পরমার্থিক দৃষ্টিতে স্বয়ং উৎপন্ন আত্মা বলা যেতে পারে। এটাই হচ্ছে বুদ্ধের মূল উপদেশ, যার অনোপলব্ধিতে বুদ্ধের অনাত্মদর্শন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ অসম্ভব। 'সর্বধর্ম অনাত্ম'- এ বিষয়টি যার পক্ষে জানা সম্ভব হয় না তিনি জানতে পারেন না যে, প্রকৃত পক্ষে কায় ও চিত্ত ধারার অবিরাম উৎপত্তি ও বিলয় ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনা করা বৃথা। এই সন্ততির বাইরে বা অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র কোনো নিত্য সত্তা নেই- এটা না বুঝলে বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনকে জানা যাবে না।

অনাত্ম দর্শন মতে, নিজের আত্মসত্তার স্থায়ীত্বের ভ্রান্তবোধ থেকেই আত্ম ভিন্ন স্থায়ী বহির্দ্রব্যের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। এর ফলে লোভ, দ্বেষ, প্রেম, ভালো, মন্দ ইত্যাদি দ্বন্দ্বে ভরা সংসারের সৃষ্টি হয়। আত্মার স্থায়ী সত্তা বা অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করার ফলে সকল কুপ্রবৃত্তি ও কামনা বাসনার বিকাশ ঘটে। আত্মসত্তার স্থায়ীত্বের ভ্রান্ত ধারণাই সকল দুঃখের মূল। অনিত্যতা সম্পর্কে যতদিন ভ্রান্ত ধারণা থাকবে ততদিন মানুষ স্থায়ী বা অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাস করবে। আত্মাই সুখ দুঃখ অনুভব করে, আত্মাই কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করে, আত্মাই কর্মানুসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে ইত্যাদি ধারণা পোষণকারী ব্যক্তির পক্ষে দুঃখ বিমুক্তি অসম্ভব (জিতেন্দ্র বড়ুয়া ২০০০, ৫৫) ।

বৌদ্ধ ধর্ম দুঃখ মুক্তির ধর্ম। দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জগতের নিত্যতা-অনিত্যতার কিংবা আত্মার বিদ্যমানতা: অবিদ্যমানতার সমাধান খোঁজা নিরর্থক। তাই তথাগত বুদ্ধ এ জাতীয় প্রশ্নে নীরব ছিলেন। বুদ্ধ চুলমালুঙ্ক্য সূত্রে (মহাস্থবির ১৯৫৬, ৭৪-৮৩) মালঙ্ক্যপুত্র কর্তৃক এ রকম দশটি প্রশ্নকে অব্যাকৃত তথা

অনর্থকর বলে বর্জন করেছেন। এ দশটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথম চারটি জগৎ সম্পর্কিত এবং বাকীগুলো হলো আত্মা ও দেহ বিষয়ক। এ প্রসঙ্গে তথাগত বুদ্ধ বললেন, মালঙ্ক্য পুত্র, জগৎ শাশ্বত কি অশাশ্বত ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান হোক বা না হোক তাতে কি কোনো ব্যক্তির দুঃখ মুক্তি নির্ভর করে? তিনি আরো বললেন,

> মালঙ্ক্য পুত্র, জগৎ শাশ্বত হোক বা অশাশ্বত হোক মানব মাত্রই জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি দুঃখের অধীন। এই জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি দুঃখ থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় তার উপায় আমি প্রচার করেছি। তুমি যে সকল প্রশ্ন করেছ, তার সমাধান আমি দিই নি। কারণ এর দ্বারা কোনো উপকার হয় না। এর দ্বারা লোভ-দ্বেষ-মোহ দূর হয় না ; সম্যক জ্ঞানও লাভ হয় না ; নির্বাণেও উপনীত হওয়া যায় না (মহাস্থবির ১৯৫৬, ৭৫-৭৮)।

বুদ্ধ এটাই বারবার বলেছেন যে, জগতে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয় বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, ইপ্সিত বস্তু অপ্রাপ্তি এবং সংক্ষেপে পঞ্চোপাদানে দুঃখ বিদ্যমান। জন্মের কারণে এসব দুঃখ নিরন্তর ভোগ করতে হয়। তবে এ জন্মের আদি-অন্ত অনুসন্ধান করাই বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধ যাবতীয় দুঃখকে দেখেছেন যা চির বিদ্যমান; যাকে দুঃখ সত্য বা প্রথম আর্যসত্য বলা হয়। দুঃখের কারণ রয়েছে, যা অবিদ্যা এবং তৃষ্ণা থেকে উৎপত্তি হয়, এটিকে বলা হয় দুঃখ সমূদয় বা দ্বিতীয় আর্যসত্য। দুঃখের কারণ অবিদ্যা-তৃষ্ণার নিরোধ করা সম্ভব, যাকে বলা দুঃখ নিরোধ বা তৃতীয় আর্যসত্য। দুঃখ নিরোধের যে উপায় তাকে বলা হয় দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদ বা চতুর্থ আর্যসত্য। দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদ বা দুঃখ থেকে বিমুক্তির উপায়কে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে - যা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই মার্গ সম্যক অনুশীলনের মাধ্যমেই বিমুক্তি লাভ সম্ভব, অর্থাৎ জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ইত্যাদি দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এক কথায় জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয়ে যায়।

বুদ্ধ পরবর্তী দার্শনিকদের মতে আত্মার স্বরূপ

বুদ্ধের মূল ধর্মদর্শনের ইতিহাস আড়াই হাজার বছরের অধিক প্রাচীন। এ দর্শনের ওপর পরবর্তীকালে বহু দার্শনিক আলোচনা করেছেন এবং বুদ্ধের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের স্ব স্ব মতবাদ প্রয়োগ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে তাঁদের এসব মতবাদকে বুদ্ধদর্শনের সম্পূরক অংশ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে; কোনোভাবেই বিরুদ্ধ মতবাদ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। স্মর্তব্য যে সুদীর্ঘকালের পথ পরিক্রমায় বুদ্ধের মূল দার্শনিক ভিত অবিকৃত থাকলেও পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বিভিন্নভাবে বুদ্ধের দর্শনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধ পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বিশেষ করে ভদন্ত নাগসেন (খ্রিষ্টীয় ১ম শতক), আচার্য নাগার্জুন (খ্রিষ্টীয় ২য় শতক), আচার্য অসঙ্গ (খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতক), আচার্য বসুবন্ধু (৪র্থ শতক), আচার্য ধর্মকীর্তি (খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক) প্রমুখ দার্শনিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত দার্শনিকগণ বুদ্ধের অনাত্মবাদ তত্ত্বটিকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়েছেন। নিম্নে তাঁদের অভিমত আলোচনা করা হলো।

গ্রীকরাজ মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের কথোপকথন

রাজা মিলিন্দ জিজ্ঞেস করেন, ভন্তে, আপনি কিরূপে জ্ঞাত হয়ে থাকেন ? আপনার নাম কী ?

উত্তরে নাগসেন বলেন, মহারাজা! আমাকে নাগসেন বলে সম্বোধন করে। এই নাগসেন কিন্তু সংজ্ঞা প্রকাশ ব্যবহার ও নাম মাত্র, এখানে কোনো ব্যক্তি বা অবয়বী উপলব্ধি হয় না।

রাজা মিলিন্দ বলেন, যদি ব্যক্তি না থাকে তবে কে আপনাকে চীবরাদি চতুর্প্রত্যয় প্রদান করে, কে উপভোগ করে, কে ভাবনা করে, কে মার্গফল প্রত্যক্ষ করে, কে প্রাণিহত্যাদি পাপকর্ম সম্পাদন করে ? তাহলে কুশলাকুশল নেই, কুশলাকুশলের কর্তা নেই, ভোক্তা নেই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফলও নেই। আপনি যে

বলেন লোকে আপনাকে 'নাগসেন' বলে সম্বোধন করে, এখানে নাগসেন কে ? আপনার কেশ, লোম, নখ, দাঁত, ত্বক, মাংস নাগসেন কি ? অথবা আপনার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান কি নাগসেন ? কিংবা এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিই কি নাগসেন ?

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন বলেন, না, মহারাজ।

অতঃপর ভদন্ত নাগসেন রাজা মিলিন্দকে জিজ্ঞেস করেন, মহারাজ! আপনি পদব্রজে নাকি রথে আরোহণ করে এখানে এসেছেন ?

রাজা বললেন, রথে আরোহণ করে।

নাগসেন এবার জিজ্ঞেস করেন, মহারাজ আপনি যে রথে আরোহণ করে এসেছেন, সেই রথ কী ? ঈষা কী রথ ? অক্ষ কী রথ ? অথবা রথচক্র, পঞ্জর, রথদণ্ড, যুগ, রথচালন - যষ্টি, রজ্জু, চাবুক কী রথ ?

রাজা প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, না, ভন্তে। ঈষা, অক্ষ, চক্র ইত্যাদির সমবায়ে সুসংবদ্ধতা হেতু রথ। এটা সংজ্ঞা মাত্র, ব্যবহারিক নাম মাত্র।

নাগসেন বলেন, উত্তম মহারাজ। রথ কী আপনি তা ভালোভাবেই জানেন। ঠিক অনুরূপ মহারাজ কেশ লোমাদি রূপ এবং বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান- এই পঞ্চস্কন্ধের সুসংবদ্ধতা হেতুই নাগসেন। এগুলোকে আশ্রয় করেই নাগসেন সংজ্ঞা, ব্যবহার, প্রকাশ ও নাম মাত্র প্রবর্তিত হচ্ছে। পরমার্থত এখানে পৃথক কোনো ব্যক্তি বা আত্মার অস্তিত্ব নেই (ভট্টাচার্য্য ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ৪৫-৫১)।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, আত্মার বস্তুগত কোনো সত্তা নেই। আত্মা একটি মানসিক প্রতীক মাত্র। দেহ-মন, বস্তু সব কিছুই জটিল এবং ক্ষণস্থায়ী। রথের ঈষা, অক্ষ, চক্র, যুগ, রজ্জু, দণ্ড ইত্যাদি সমস্ত অংশ বাদ দিলে রথ বলতে কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তেমনি পঞ্চস্কন্ধকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করলে কোনো ব্যক্তি বা আত্মাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। নামটি একটি সংজ্ঞামাত্র। পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়েই দেহ ও মন। পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কোনোটিই আত্মা নয় কিংবা সমন্বিত পঞ্চস্কন্ধও আত্মা নয়। ভিক্ষুণী বজিরা সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে:

যথাহি অঙ্গ সম্ভারা হোতি সদ্দো রথো ইতি,
এবং খন্ধেসু সন্তেসু হোতি সত্তো'তি সম্মুতী'তি *(মিলিন্দ পঞ্ঞেো* (পালি) ২০১৩, ২১)।

-বিভিন্ন উপকরণ সহযোগে যেমন 'রথ' তেমনি স্কন্ধসমূহের সহযোগে ব্যবহারিক 'সত্ত'।

রাজা মিলিন্দ পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, ভদন্ত নাগসেন, জ্ঞাতা বা আত্মার (বেত্তা) কি উপলব্ধি হয় ? তিনি বললেন, এই অভ্যন্তরে যে জীব (আত্মা) চোখ দিয়ে রূপ দর্শন করে, শ্রোত্র দিয়ে শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায়ের দ্বারা স্পর্শনীয় বস্তু স্পর্শ করে, মনের দ্বারা ধর্মকে বিশেষভাবে জানে।[২]

উত্তরে ভদন্ত নাগসেন বলেন, বেদগু বা বেত্তা বলতে কোনো তত্ত্ব নেই। চক্ষু-রূপ আলোক ও মনস্কার হেতু চক্ষু বিজ্ঞান যেমন উৎপন্ন হয়, তৎ সহজাত স্পর্শ-বেদনা-সংজ্ঞা-চেতনা-একাগ্রতা-মনস্কার-জীবিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি চৈতাসিকও [৩] উৎপন্ন হয়। এগুলো এক সাথে উৎপন্ন হয়, একই সাথে বিলয় হয়। এই চিত্ত-চৈতসিক আবার একই আলম্বনকে আশ্রয় করে। তথা শ্রোত্র–শব্দ-ঈথর-মনস্কার হেতু শ্রোত্রবিজ্ঞান এবং সহজাত স্পর্শ বেদনাদি চৈতসিকগুলোও একই সাথে বিলোপ সাধিত হয়। অনুরূপ ঘ্রাণ-জিহ্বাদি সম্বন্ধেও একই রকম। এখানে শাশ্বত আত্মার বা বেত্তার কোনো উপলব্ধি হয় না। চৈতসিক বেদনাই বেত্তা, সংজ্ঞা জ্ঞাতা, চেতনা চেতেতা, জীবিতেন্দ্রিয় জীবেতা, বিজ্ঞান বিজ্ঞাতা, মনস্কার নিবেশেতা, একাগ্রতা ধারেতা।

অতএব, পঞ্চস্কন্ধের কোনোটিই আত্মা নয়, পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিও আত্মা নয়। এটি একটি সন্ততি মাত্র। এই উৎপন্ন হয়, এই লয় হয়। নাগসেন বলেন,

এবমেব খো মহারাজ, ধম্ম সন্ততি সন্দহতি;
অঞ্ঞো উপ্পজ্জতি, অঞ্ঞো নিরুজ্ঝতি,
অপুব্বং অচরিমং বিয় সন্দহতি তেন
ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো পচ্ছিম
বিঞ্ঞান সংগহং গচ্ছতী'তি (ভট্টাচার্য্য ১৩১৫, ৮০)।

আচার্য নাগার্জুন (১৭৫ খ্রিঃ)

আচার্য নাগার্জুন মাধ্যমিক শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ হতেই শূন্যবাদের প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, বিশ্ব এবং এর সকল জড়-অজড় পদার্থ পরস্পর কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত। এগুলো কোনো প্রকার স্থির, শাশ্বত, নিত্য (ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি) হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বা শূন্য। নাগার্জুনের মতে, আত্মার সাথে পঞ্চস্কন্ধের সাদৃশ্য বা পার্থক্যের প্রশ্নই আসে না। কারণ পঞ্চস্কন্ধ যদি আত্মা হয় তাহলে আত্মা উৎপত্তি ও বিলয়ধর্মী হতো, আবার আত্মা যদি পঞ্চস্কন্ধ হতে ভিন্ন হতো তাহলে এর মধ্যে পঞ্চস্কন্ধের লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকতো না। সুতরাং আত্মার মধ্যেও পঞ্চস্কন্ধ নেই, পঞ্চস্কন্ধের মধ্যেও আত্মা নেই।[৪] অথচ জীবদেহ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে পঞ্চস্কন্ধ ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না। অতএব যেখানে আত্মার কোনো অস্তিত্বই নেই সেখানে পঞ্চস্কন্ধের সাথে আত্মার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আত্মা হচ্ছে শুধু ব্যবহারিক বাক্য মাত্র, সংজ্ঞা, নাম এবং প্রজ্ঞপ্তি মাত্র-আর কিছু নয়। *(দীঘ নিকায়* ১ম খণ্ড, ২০২) নাগার্জুনের মতে, পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে অবাস্তব, অন্তঃসার রহিত, অশাশ্বত, অনাত্ম, অনাত্মনীয়, অনিত্য, শূন্য এবং বিপরিণামধর্মী। জগতের যাবতীয় আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক ধর্মসমূহ অনিত্য, শূন্য এবং অসার ; কারণ এগুলো কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। যা কার্যকারণ শৃংখলে আবদ্ধ তা স্ব-ভাববিহীন অর্থাৎ এতে নিত্য বা শাশ্বত আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই।

আচার্য অসঙ্গ (৩৫০ খ্রিঃ)

উপনিষদীয় আত্মবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে আচার্য অসঙ্গ বলেন, যে দর্শন করে সে আত্মা এটাও যুক্তিযুক্ত নহে। আত্মার ধারণা যেমন প্রত্যক্ষ পদার্থে হয় না, তেমন অনুমানগম্য পদার্থেও নহে। যদি প্রচেষ্টা (শরীর ক্রিয়া) বুদ্ধি হেতুক বলা যায়, তবে 'আত্মা চেষ্টা করছে' – এটা বলাও ঠিক নহে। নিত্য আত্মা চেষ্টা করতে অক্ষম। নিত্য আত্মা সুখ কিংবা দুঃখে লিপ্ত হতে পারে না, বস্তুতপক্ষে ধর্মসমূহে আত্মা এক কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। বিশ্বের সকল ধর্ম (বস্তু) অনিত্য, অধ্রুব, অন্-আশ্বাসিক, বিকারী, জন্ম-জরা-ব্যাধির অধীন। দুঃখই এদের যথার্থ স্বরূপ। ব্যবহারের সুবিধার্থেই আত্মার কল্পনা করা হয় মাত্র। বস্তুতঃ আত্মা নামের কোনো নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নেই (সাংকৃত্যায়ন ২০১২, ৮৮)।

আচার্য বসুবন্ধু (৬০০ খ্রিঃ)

আচার্য অসংগের কনিষ্ট ভ্রাতা বসুবন্ধু বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম। তিনিও শাশ্বত আত্মাকে অস্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন এরূপ অজ (জন্মহীন) নিত্য, শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় আত্মার কোনো অর্থ ক্রিয়াকারিত্ব নেই। এটা একটি প্রথাগত ব্যবহার বা নাম মাত্র। কোনো ব্যক্তি একক সত্তা নয় ; সে কতকগুলো ক্ষণিক শক্তির অথবা প্রবণতার নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা মাত্র ; যাকে সাধারণ লোকেরা একটি সত্তা বলে বিশ্বাস করে, একটি নির্দিষ্ট নামে অভিহিত করে। বসুবন্ধু মনে করেন, কোনো এক ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বর্ণনামূলক অথবা অনুমানমূলক, প্রত্যক্ষলব্ধ নয়। বুদ্ধি, স্মৃতি, কল্পনা, ইচ্ছা ইত্যাদি সবই ক্ষণিক কর্মের একটি বর্ণনামূলক পরিচয় হলো ব্যক্তি। কখনো একজন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে জানি না, কখনোই ইন্দ্রিয় অথবা বুদ্ধি দ্বারা তাকে ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি না। বর্ণনামূলক জ্ঞানের মাধ্যমে এবং সদৃশ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তিকে ব্যক্তি বলে স্বীকার করা হয় মাত্র। 'আত্মা' কিংবা

'জীব' শব্দটি ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু আসলে তা একগুচ্ছ নিয়ত পরিবর্তনশীল উপাদান ছাড়া কিছুই নয় (ঘোষ ১৯৮৩, ১৩৫-১৩৬)।

আচার্য ধর্মকীর্তি (৬০০ খ্রি.)

আচার্য ধর্মকীর্তি ছিলেন অন্যতম শক্তিশালী বৌদ্ধ দার্শনিক। তিনি তাঁর প্রখ্যাত *প্রমাণ বার্ত্তিক* গ্রন্থে আত্মবাদ খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি সুখী হই, কিংবা দুঃখী না হই- এই তৃষ্ণা বা ইচ্ছা পোষণকারীর যে 'আমি' এই ধারণা জন্মে, এটাই 'আত্মবাদ'। 'আমি' এই ধারণা ছাড়া কেউ আত্মার প্রতি স্নেহ উৎপাদন করতে পারে না ; আর আত্মার প্রতি এরূপ স্নেহ ছাড়া সুখের কামনা পোষণ করে কারো পক্ষে পরবর্তী জন্মে বা গর্ভাভিমুখে ধাবিত হওয়া অসম্ভব (প্রমাণ বার্ত্তিক, ২। ২০১-২)। 'আত্মার ধারণা কেবল মোহ, আর ওটাই যাবতীয় অনর্থের মূল বা দোষের আকার (প্রমাণ বার্ত্তিক, ২। ১৯৫)।

ধর্মকীর্তি বলেন, যিনি আত্মা স্বীকার করেন তাঁর 'আমি' এ প্রকারের স্নেহ জাগ্রত থাকে, স্নেহ হতে সুখের তৃষ্ণা জন্মে আর তৃষ্ণা দোষ রাশিকে আচ্ছাদন করে। দোষ আচ্ছাদিত হলে সেখানে তিনি গুণরাশি দেখেন, তার গুণদর্শী তৃষ্ণার্ত হয়ে 'আমার সুখ' প্রার্থনা করে, সুখ প্রাপ্তির জন্য উপায়সমূহ অর্থাৎ পুনর্জন্মাদি গ্রহণকরে থাকে। এই সৎকায় দৃষ্টি বশতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মার ধারণা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সংসারে বিদ্যমান থাকেন। ... যিনি রীতিমত আত্মার প্রতি স্নেহ উৎপাদন করেন তিনি আত্মীয় (সুখ-সাধন) হতে রাগ মুক্ত হতে পারেন না। আত্মার ধারণা সর্বদা নিজ স্নেহকে দৃঢ় করে। ... বস্তুত আত্মা নহে-নৈরাত্ম্যই বিদ্যমান, কিন্তু নৈরাত্ম্যতে যখন আত্ম স্নেহ জাগে তখন ওটা হতে যত লাভ হয়, তদনুসারে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। - এই প্রকারে নিত্য আত্মা যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে না এবং ধর্ম পরলোক ও মুক্তিতে ওটার অঙ্গীকার দ্বারা বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে (সাংস্কৃত্যায়ন ২০১২, ১১৭-১১৮)।

আধুনিক দার্শনিকদের আত্মা সম্পর্কে অভিমত

বিংশ শতকের শুরুতে দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স (William James) বলেন, আমরা যাকে আত্মা নামে অভিহিত করি সেটি চিন্তার প্রবাহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। চিন্তা এবং চিন্তার কর্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি এরূপ যুক্তির মাধ্যমে দেকার্তের আত্মতত্ত্ববাদকে খণ্ডন করেন। উইলিয়াম জেম্‌সের মতে, প্রত্যেকটি মুহূর্তের স্পন্দন ব্যতীত কর্তা বলতে কিছু নেই। চৈতন্যকে একটি প্রবাহরূপে চিহ্নিত করা চলে। যেসব বস্তুকে আমরা জানি তা এই প্রবাহেরই কতগুলো স্পন্দন হিসেবে জ্ঞাত হয়। অপরিবর্তনী কোনো শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব নেই। কর্তা মাত্রই ক্ষণস্থায়ী একটি বিষয়ীর স্থলে আর একটি বিষয়ী সাথে সাথে স্থান দখল করে নেয়। এই স্থান পরিবর্তন অতি দ্রুত সম্পন্ন হয় বলে বাহ্যতঃ একটি একতার আভাস প্রকাশ পায়। আমিত্বের প্রত্যেকটির অবস্থাই এক একটি নতুন সমবায় (ঘোষ ১৯৮৩, ১৩৮)। জেম্‌স আত্মাকে অলংকার মূলক শব্দ মনে করেন এবং আত্মার অনুরূপ কোনো বাস্তব সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত Ven.Walola Rahula আত্মার অনস্তিত্ব সম্পর্কে বলেন,

> It must be repeated here that according to Buddhist philosophy there is no permanent, unchanging spirit which can be considered 'Self', or 'Soul', or 'Ego', as

> opposed to matter, and that consciousness (vinnana) should not be taken as 'spirit' in opposition to matter.This point has to be particularly emphasized, because a wrong notion that conciousness is a sort of Self or Soul that continues as a permanent substance through life, has persisted from the earliest time to the present day. (1978, 23-24)

বট্রাণ্ড রাসেলও (Bertrand Russell) (ঘোষ ১৯৮৩, ১৩৯, আহমদ, সম্পাদিত রমেন্দ্রনাথ ঘোষ , ১৯৭৩, ৬৩) মনে করেন যে, ব্যক্তির কোনো পরাতাত্তিক এবং অনভিজ্ঞাত একক ও অতুলনীয় সত্তা নেই। অভিজ্ঞতার পারস্পর্য নিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তথা ব্যক্তির আত্মা। অনুভূতি, চিন্তা, আবেগ, কল্পনা, স্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা মানুষের বিশেষ বস্তু কিংবা আত্মার জ্ঞান জন্মায়। এই জ্ঞান হচ্ছে অনুমান ভিত্তিক। অনুমানের পেছনে বস্তু কিংবা আত্মা বলে কিছু আছে কিনা তা প্রতিপাদনযোগ্য জ্ঞান সম্ভব নয়। সম্ভবত আত্মা একটি নাম মাত্র। তাঁর মতে, আত্মা কিংবা দেহ সুবিধাজনক নাম মাত্র। অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক ডেভিড হিউমও (David Hume) শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁর অভিমতও ভদন্ত নাগসেনের অভিমতের মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। হিউম বলেন, যখন আমি যাকে 'আমি' বলে নিবিষ্টভাবে জানার জন্য অনুপ্রবেশ করি, তখন আমি যার নাগাল পাই তা হলো উষ্ণ বা শীতল, আলো বা ছায়া, প্রেম বা ঘৃণা, সুখ বা দুঃখের সংবেদন মাত্র (সান্যাল ২০০২, ১০০)। হিউম এসব সংবেদেনের অতিরিক্ত মন বা আত্মা বলে কোনো স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। নাগসেন ও হিউম উভয়ের দর্শনের মূল ভিত্তি মূলত এক রকম এবং সিদ্ধান্তও এক প্রকারের। কল্যাণ-অকল্যাণ, দ্রব্য-গুণ, দেশ-কাল প্রভৃতি সম্পর্কে সমালোচনার পদ্ধতি উভয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভিত্তিক, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এবং অবভাসবাদভিত্তিক।

বৌদ্ধ দর্শনের নৈরাত্ম্যবাদ সম্পর্কে আত্মবাদীরা দু'টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রথমটি হলো- আত্মা যদি কোনো চিরন্তন সত্তা না হয়ে কেবল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ হয় তাহলে ব্যক্তি অভিন্নতাকে (Personal identity) কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? একই ব্যক্তির বয়সানুক্রমে যে বিভিন্ন অবস্থা, এই বিভিন্ন অবস্থার ধারাবাহিকতার মধ্যেও যে এক অভিন্ন ব্যক্তি বিরাজ করে, তা কিভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে ?

উত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, মানুষের মধ্যে কোনো অপরিবির্তনীয় সত্তার অস্তিত্ব নেই সত্য, তবে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও একটা ধারাবাহিকতা আছে। প্রতিটি অবস্থা একদিকে যেমন অন্য অবস্থা থেকে উদ্ভূত ঠিক তেমনি

ভাবেই পরবর্তী অবস্থাটি সৃষ্টি করে চলেছে। সুতরাং জীবনের ধারাবাহিকতার মূলে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধের যোগসূত্র রয়েছে। বিষয়টি নাগসেন একটি চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। সারারাত একটি প্রদীপ জ্বলছে। যদিও প্রতিমুহূর্তে আমরা একটিমাত্র প্রদীপ শিখাই দেখি, আসলে যে কোনো মুহূর্তের প্রদীপ শিখা একও নহে, ভিন্নও নহে। ঠিক তেমনি একই ধর্ম সন্ততি বা চিত্ত সন্ততি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের রূপ পরিগ্রহ করে। আবার এটাই একই নিয়মে জীবনের অবসানে অন্য রূপ পরিগ্রহ করে (সুকোমল চৌধুরী ১৯৯৭, ৭৮)।

অপর প্রশ্নটি হচ্ছে যদি সনাতন আত্মা অস্বীকার করা হয় তাহলে জন্মান্তর কিভাবে সম্ভব?

এ প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, জন্মান্তর বলতে কোনো চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহণ নয়। জন্মান্তর বলতে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব বোঝায়। যেমন একটি প্রদীপ শিখা থেকে আর একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা যায়। প্রদীপ শিখা কিন্তু ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়। অনুরূপভাবে জীবের কর্মবীজ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত (সকল প্রকার আসব-ক্লেশ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত) মৃত্যুর পর কর্মের শক্তি অনুযায়ী অপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে। এটিকে বলা হয় 'সন্ততি' বা 'প্রবাহ', এখানে তথাকথিত শাশ্বত আত্মার জন্মান্তর বোঝায় না।

উপসংহার

আত্মার ধারণা কল্পনা প্রসূত। নিত্যবাদী বা শাশ্বতবাদীরা আত্মাকে অজয়, অমর, অব্যয় চিরস্থায়ী বলে ধারণা পোষণ করেন। ভারতীয় দর্শনে একমাত্র গৌতম বুদ্ধই আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। একটি জীবন থেকে অন্য কোনো জীবনে আত্মার প্রবেশ করা সম্ভব নয়। কেবল ঘটনা পরম্পরায় নতুন জীবনের উদ্ভব ঘটে। কোনো এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে যেসব মানসিক প্রক্রিয়াগুলো দেখা যায়, সেই মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর ধারা বা প্রবাহই হলো আত্মা। চিন্তা, ইচ্ছা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যেকটি ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী। এই প্রবাহের অন্তরালে কোনো শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব নেই। এই মতবাদই নৈরাত্ম্যবাদ বা অনাত্মবাদ নামে পরিচিত।

বুদ্ধ অনাত্ম বলতে কোনো আত্মার বিপরীত কোনো অভাবাত্মক বস্তু বোঝাতে চাননি। বৈদিক উপনিষদে আত্মাকেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বতসত্য বলে মান্য করা হয়েছে। আত্মার অর্থ যদি নিত্য হয় তাহলে অনাত্মা মানে অ-নিত্য। বুদ্ধ মধ্যম নিকায়ের চুল সচ্চক সুত্তে বলেছেন, রূপ অনাত্মা, বেদনা অনাত্মা, সংজ্ঞা অনাত্ম, সংস্কার অনাত্ম, বিজ্ঞান অনাত্ম, সমগ্র ধর্মই অনাত্ম।

অনাত্মবাদ মতে স্থায়ী আত্মায় বিশ্বাস করা এক প্রকার মহাভ্রম। বুদ্ধ শাশ্বত আত্মাকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন। বুদ্ধের মতে, জগতের সকল বস্তুই অনিত্য। অনিত্য বস্তুতে আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কাজেই নিত্য আত্মার ভ্রমধারণা পরিত্যাগ করা উচিত।

টীকা

১। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ,
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ,
নিত্য সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ।

২. যো ভন্তে অব্ভন্তরে জীবো চক্খুনা রূপং পস্সতি, সোতেন সদ্দং সুণাতি ঘাণেন গন্ধং ঘায়তি, জিব্হায় রসং সাসতি, কায়েন ফোট্ঠব্বং ফুসতি, মনসা, ধম্মং বিজানাতি।

৩. চৈতসিক – চিত্তের আলম্বনকে চৈতসিক বলে। চিত্ত ৮৯ প্রকার এবং চৈতসিক ৫২ প্রকার। তম্মধ্যে সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক ৭ প্রকার, প্রকীর্ণ চৈতসিক ৬ প্রকার, অকুশল চৈতসিক ১৪ প্রকার, শোভন চৈতসিক ১৯ প্রকার, বিরতি চৈতসিক ৩ প্রকার, অপ্রমেয় চৈতসিক ২ প্রকার এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক ১ প্রকার।

৪। আত্মা স্কন্ধা যদি ভবেদায়ব্যয় ভাগ ভবেৎ।
সন্ধেভ্যো হন্যো যদি ভবেদ্ ভবেদ স্কন্ধ লক্ষণঃ মাঃ বৃঃ (৩৪০)।

প্রাথমিক উৎস

করুণাবংশ ভিক্ষু, (সম্পাদনায়) *সংযুক্ত নিকাযো*, ৩য় খণ্ড, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ, ২০১৩ ।

করুণাবংশ ভিক্ষু, (সম্পাদনায়) *মিলিন্দ পঞ্হো*, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ, ২০১৩।

ধর্মাধার মহাস্থবির, *মধ্যম নিকায়* (অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ), বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৫৬।

বেণীমাধব বড়ুয়া, *মধ্যম নিকায়* (অনুবাদ) কলিকাতা, ১৯৪০।

ভিক্ষু জে. প্রজ্ঞাবংশ মহাথের, (অনূদিত) *মহাবর্গ পরিক্রমা*, চট্টগ্রাম, ২০০০।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, *মিলিন্দ পঞ্হো* (অনুবাদ) প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

সাধন কমল চৌধুরী, *বিশুদ্ধ মজ্ঝিম নিকায়* (অনুদিত), করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪১৫ ।

দ্বৈতয়িক উৎস

এম. মতিউর রহমান, *বৌদ্ধ দর্শন তত্ত্ব ও যুক্তি* (সম্পাদিত), প্রবন্ধ-গৌতমের ধর্মে আত্মার স্থান, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩।

জগদীশ্বর সান্যাল, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ ২০০২।

জিতেন্দ্রি লাল বড়ুয়া, বৌদ্ধ ধর্মে কর্মবাদ বনাম সৃষ্টি রহস্য, ঢাকা, ২০০০।

দেবব্রত সেন, *ভারতীয় দর্শন* (২য় সংস্করণ), কলিকাতা ১৯৮৫।

নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ : ধর্ম ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা, ১৯৯০।

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, (৪র্থ সংস্করণ) ১৯৯৯।

মফিজ উদ্দীন আহমদ, সম্পাদিত *বার্ট্রান্ড রাসেল*, প্রবন্ধ- রাসেলের নৈতিক দর্শনের ভিত্তি, রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩ ।

রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বৌদ্ধ দর্শন (অনুবাদ ধর্মধার মহাস্থবির), বৌদ্ধধমাঙ্কুর সভা, কলকাতা, পুনমূদ্রণ, ২০১২।

সুকোমল চৌধুরী, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৭।

Malalasekhera, G.P ; *The Truth of Anatta* , 1986 .

Mahathera, Nyanatiloka; *Buddhist Dictionary Manual of Buddhist Terms and Doctrines*,(Forth Edition) Buddhist Publication Society,1980.

Ven Rahula, Walpola ; *What the Buddha Taught*, The Corporate Body of the Buddha. Educational Foundation, Taiwan, 1978.